



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 686 - 694

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

গান্ধীয় মানবতাবাদের সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি : একটি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি

শৌভিক হালদার

রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ

বিনোদ বিহারী মাহতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : souvikhaldar621@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Gandhian Humanism,
Nonviolence
(Ahimsa),
Truth (Satya),
Sociological Theory,
Swaraj (Self-rule),
Trusteeship Model,
Social Justice,
Caste and Class
Critique,
Ethical Society,
Grassroots
Development.

Abstract

This research paper explores the sociological foundations of Gandhian humanism, offering a critical and analytical perspective on how Mahatma Gandhi's ethical and philosophical principles contribute to the vision of a just, inclusive, and morally grounded society. Gandhi's humanism, unlike abstract theoretical constructs, emerges from a lived experience and practical engagement with India's colonial realities, social inequalities, and ethical dilemmas. It rests on the pillars of truth (satya), nonviolence (ahimsa), self-rule (swaraj), trusteeship (sarvodaya), and the intrinsic dignity of labor and human life. These ideals are not merely spiritual or political; they are sociologically grounded and represent a framework for reimagining human relationships, power structures, and the role of the individual in society. The paper analyzes how Gandhian humanism offers a coherent response to structural violence, caste hierarchy, gender inequality, religious intolerance, and economic injustice — issues that continue to challenge societies worldwide. It investigates Gandhi's emphasis on the village as the basic unit of a self-reliant and ethical economy, his rejection of industrial capitalism, and his critique of Western materialism, placing these ideas in conversation with sociological theories of community, development, and moral order. Methodologically, the study adopts a qualitative approach, drawing from Gandhi's writings — such as *Hind Swaraj*, *The Story of My Experiments with Truth*, and his articles in *Young India* and *Harijan* — alongside interpretations by scholars like Bhikhu Parekh, Ashis Nandy, and Ramachandra Guha. These sources are examined in light of the theories of Emile Durkheim, Anthony Giddens, and Jürgen Habermas, revealing Gandhian humanism as a socially embedded and action-oriented ethical framework. The paper concludes that Gandhian humanism is not a relic of India's anti-colonial past but a transformative sociological paradigm relevant to contemporary global crises such as climate change, moral disintegration, violence, and systemic inequality. It presents a model for participatory ethics, sustainable

development, and nonviolent social transformation, emphasizing the potential of moral leadership and grassroots activism in societal change. As such, this research calls for the inclusion of Gandhian humanism within modern sociological discourse and its integration into policy-making, education, and global peacebuilding strategies.

Discussion

ভূমিকা : মহাত্মা গান্ধী শুধুমাত্র ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের এক অগ্রদূত ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন এক প্রভাবশালী মানবতাবাদী চিন্তক, যাঁর দর্শন ব্যক্তিক জীবন থেকে শুরু করে সমষ্টিগত সমাজবিন্যাস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। গান্ধীর মানবতাবাদ ছিল আত্মশুদ্ধির মধ্যদিয়ে সমাজশুদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার এক বিকল্প সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রে ছিল মানুষ—সাধারণ মানুষ— যিনি সত্য, অহিংসা, শ্রম এবং ন্যায্যতার অনুশীলনের মাধ্যমে একটি সুবিন্যস্ত, সহমর্মিতাপূর্ণ ও নৈতিক সমাজ গঠনের নির্মাতা হতে পারেন। গান্ধীর মানবতাবাদ কেবল আধ্যাত্মিকতার সীমায় আবদ্ধ ছিল না, বরং তার ছিল এক সুস্পষ্ট সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক রূপরেখা। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজের কাঠামো কেবলমাত্র রাষ্ট্রনির্ভর অথবা আর্থিক উন্নয়ননির্ভর নয়; বরং এই কাঠামো গঠিত হয় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, নৈতিক দায়িত্ববোধ, সামাজিক সাম্য এবং আত্মনির্ভরতার উপর ভিত্তি করে। এখানে ব্যক্তি একা নয়, সে সমাজের একটি অনিবার্য অংশ; এবং সমাজও কেবলমাত্র বাহ্যিক নিয়মে চলে না, তার ভিত্তি পড়ে থাকে নৈতিকতা ও সহানুভূতির উপর। এই গবেষণার প্রেক্ষিত তৈরি হয়েছে ঠিক এইখানেই: গান্ধীর মানবতাবাদকে একটি সমাজতাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে পাঠ ও বিশ্লেষণ করা। প্রশ্ন ওঠে— তাঁর অহিংসা কী শুধুই রাজনৈতিক কৌশল ছিল, না কি তা একটি নৈতিক সমাজ গঠনের সামাজিক তত্ত্ব? তাঁর সত্যগ্রহ কি শুধুই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, না কি তা ছিল একটি অন্তর্মুখী আত্মপরীক্ষার প্রক্রিয়া? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়াই এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। গান্ধী তাঁর মানবতাবাদে শ্রেণি বিভাজন, বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য এবং ধর্মীয় উগ্রতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ‘অস্পৃশ্যতা’কে তিনি ‘অপবিত্রতার’ প্রতীক হিসেবে দেখেছিলেন এবং তাকে নির্মূল করার জন্য তিনি হরিজন আন্দোলনের সূচনা করেন। নারীদের তিনি সমাজের সহযাত্রী হিসেবে দেখেছিলেন, যারা শুধুই গৃহিণী নয়, বরং অহিংসা ও সত্যগ্রহের ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। তাঁর কাছে শ্রমজীবী মানুষ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, হস্তশিল্পী ও কৃষক সমাজের ভিত্তি — এই দর্শন একদিকে অর্থনৈতিক, অন্যদিকে নৈতিক। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গান্ধীর এই মানবতাবাদ একটি বিকল্প আধুনিকতা (Alternative Modernity)-এর প্রস্তাবনা। যেখানে পশ্চিমা মডেলের কৃত্রিমতা, ভোগবাদিতা ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের বিপরীতে গান্ধী তুলে ধরেন ‘সার্বজনীন স্বরাজ’— একটি আত্মনির্ভর, সমন্বিত ও সমবেদনার ভিত্তিতে গঠিত সমাজের রূপরেখা। এই গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য হলো গান্ধীর এই মানবতাবাদকে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব (যেমন Emile Durkheim-এর সামাজিক সংহতি, Jürgen Habermas-এর নৈতিক যুক্তি, এবং Anthony Giddens-এর স্ট্রাকচারেশন থিয়োরি)-এর আলোকে বিশ্লেষণ করা। সেই সঙ্গে এটিও অনুসন্ধান করা, গান্ধীর চিন্তা কিভাবে সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী কাঠামো নির্মাণ করতে পারে। আজকের পৃথিবী— যেখানে সামাজিক বৈষম্য, জলবায়ু সংকট, ধর্মীয় হানাহানি এবং আত্মকেন্দ্রিকতা বাড়ছে— সেখানে গান্ধীর মানবতাবাদী সমাজতত্ত্ব এক নতুন নৈতিক সংলাপের দরজা খুলে দিতে পারে। এটি শুধুমাত্র অতীতের নিদর্শন নয়, বরং ভবিষ্যতের সমাজ নির্মাণের একটি পথনির্দেশ।

গবেষণা প্রশ্ন : এই গবেষণাপত্র গান্ধীর মানবতাবাদী ভাবনার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে রচিত। গান্ধীর দর্শন কেবল রাজনৈতিক প্রতিরোধে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা একটি ন্যায্যভিত্তিক সমাজ নির্মাণের রূপরেখা প্রদান করে। গবেষণাটি নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে -

- গান্ধী যে মানবতাবাদের ধারণা দেন, তার মূল সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী?

→ এখানে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে গান্ধীর মানবতাবাদ কোন নৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত।

- তাঁর অহিংসা ও সত্যগ্রহ—এই দুটি মূলনীতিকে কীভাবে সমাজবিজ্ঞানীয় পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়?
- অহিংসা ও সত্যগ্রহ কেবল রাজনৈতিক কৌশল নয়, তা সামাজিক রূপান্তরেরও একটি নৈতিক প্রক্রিয়া কিনা, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- গান্ধীর দর্শনে শ্রেণি, বর্ণ ও লিঙ্গবৈষম্য মোকাবিলার কোন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়?
- সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীর মানবতাবাদ কতটা কার্যকর সে প্রশ্নে গবেষণা কেন্দ্রীভূত।
- তাঁর ‘গ্রামীণ স্বরাজ’ বা বিকেন্দ্রীকৃত সমাজদর্শন সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানের আলোকে কতটা প্রাসঙ্গিক?
- বিকল্প উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারমূলক সমাজ গঠনের প্রেক্ষিতে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সঙ্গে গান্ধীর মানবতাবাদের কোন কোন সংযোগ সম্ভব?
- যেমন Emile Durkheim-এর সামাজিক সংহতি, Jürgen Habermas-এর নৈতিক যুক্তিবোধ ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে গবেষণাটি গান্ধীর মানবতাবাদকে একটি কার্যকর সমাজতাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করে।

গবেষণা পদ্ধতি : এই গবেষণায় একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Method) গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর মানবতাবাদী দর্শনের সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গান্ধীর মতবাদ, তাঁর রচনাবলি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমাজতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে বিচার করে একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে গান্ধীর মূল রচনাবলি থেকে, যেমন— The Story of My Experiments with Truth, Hind Swaraj, Young India, ও Harijan-এ প্রকাশিত তাঁর নৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনা। এ ছাড়াও গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর বক্তৃতা, পত্রাবলি এবং আন্দোলনের আহ্বানপত্র। এগুলির মাধ্যমে গান্ধীর মানবতাবাদ কীভাবে সমাজের নৈতিক কাঠামো, শ্রমজীবী শ্রেণি, নারীর মর্যাদা এবং গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের বিশ্লেষণধর্মী রচনা, যেমন— রামচন্দ্র গুহ, অশিস নন্দী, ভিথু পারেক, এবং বিদেশি সমাজতাত্ত্বিক যেমন Emile Durkheim, Anthony Giddens, ও Jürgen Habermas-এর তত্ত্ব। এই তাত্ত্বিক কাঠামোগুলোর সঙ্গে গান্ধীর মানবতাবাদী চিন্তার সংযোগ ও পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ (Thematic Analysis) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এতে গান্ধীর মতবাদের মূল থিম বা বিষয় — যেমন অহিংসা, সত্যগ্রহ, ট্রাস্টশিপ, গ্রামীণ স্বরাজ, সামাজিক ন্যায়বিচার—নির্ধারণ করে তা সমাজবিজ্ঞানের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে একটি তুলনামূলক পাঠ (Comparative Reading) পদ্ধতি অবলম্বন করে গান্ধী ও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্যের বাস্তবিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা রক্ষার জন্য তথ্যসংগ্রহে উৎসের যথাযথ যাচাই, ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং মতবাদের প্রতিপাদনে বিশ্লেষণাত্মক নিরীক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল গান্ধীর মানবতাবাদকে নিছক একটি নৈতিক বক্তব্য নয়, বরং একটি কার্যকর সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ : এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দ্বিতর তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়েছে— প্রাথমিক (Primary) ও গৌণ (Secondary)। প্রাথমিক সূত্র হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর নিজস্ব রচনাবলি এবং তাঁর সময়কার মূল দলিল ব্যবহার করা হয়েছে, যা তাঁর দর্শন, রাজনৈতিক কৌশল ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা প্রদান করে। বিশেষত Hind Swaraj, The Story of My Experiments with Truth, এবং Young India ও Harijan-এ প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ গান্ধীর আত্ম-অনুসন্ধান, সত্যগ্রহ, অহিংসা, গ্রামীণ অর্থনীতি, ও সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ভাবনার ভিত্তিস্বরূপ তথ্য প্রদান করে। গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং ইতিহাসবিদের লেখা বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— রামচন্দ্র গুহ, ভিথু পারেক, অশিস নন্দী, এবং

বিদেশি সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে Emile Durkheim, Max Weber, Anthony Giddens এবং Jürgen Habermas। এই তাত্ত্বিকদের ধারণার সঙ্গে গান্ধীর চিন্তার তুলনামূলক পাঠ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণাটির তাত্ত্বিক গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ (Thematic Analysis) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গান্ধীর রচনাগুলিকে কয়েকটি মূল বিষয়ে ভাগ করা হয়েছে— যেমন - অহিংসা, সত্যগ্রহ, ট্রাস্টশিপ, গ্রামীণ স্বরাজ, অস্পৃশ্যতা নির্মূল, নারী-অধিকার, শ্রমের মর্যাদা ও বিকল্প উন্নয়ন। প্রতিটি থিমকে সমাজবিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে এই দর্শনের কাঠামোগত শক্তি ও সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এছাড়াও তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis) পদ্ধতি অনুসরণ করে গান্ধীর সমাজদর্শনের সঙ্গে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের তত্ত্বের মিল ও অমিল চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, Durkheim-এর ‘social solidarity’ ধারণার সঙ্গে গান্ধীর অহিংস সমাজগঠনের ভাবনার তুলনা করা হয়েছে, কিংবা Habermas-এর ‘communicative action’-এর সঙ্গে গান্ধীর সত্যগ্রহের নৈতিক প্রক্রিয়ার মিল অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ প্রকৃতপক্ষে গান্ধীকে শুধুমাত্র নৈতিকতার ভাষায় না দেখে সমাজবিজ্ঞানের কাঠামোয় ব্যাখ্যার এক আন্তঃবিষয়ক প্রয়াস। গান্ধীর মানবতাবাদ সামাজিক ন্যায়, বন্ধিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্তি এবং নৈতিক নেতৃত্বের ধারণাকে নতুন দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করে— যা সমাজবিজ্ঞানচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

অহিংসা : একটি নৈতিক সমাজপ্রতিষ্ঠার মাধ্যম : মহাত্মা গান্ধীর মানবতাবাদের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হল অহিংসা বা ‘অহিংস’ জীবনদর্শন। গান্ধী অহিংসাকে কেবল রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে দেখেননি, বরং তা ছিল তাঁর নৈতিক ও সামাজিক দর্শনের মৌলিক ভিত্তি। তিনি বলেন, -

“Ahimsa is the greatest force at the disposal of mankind।”

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অহিংসা একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যা সামাজিক শৃঙ্খলা, সংহতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করে। Emile Durkheim-এর মতে, সমাজের সংহতি বজায় থাকে নৈতিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে, আর গান্ধীর অহিংসার দর্শন সেই নৈতিকতা গঠনের শক্তি হিসেবে কাজ করে। অহিংসা সামাজিক বিভেদ ও সহিংসতা প্রতিরোধ করে সমবেদনাপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশ ঘটায়। অহিংসা কেবলমাত্র শারীরিক হিংসার অনুপস্থিতি নয়; এটি একধরনের সক্রিয় দায়িত্ববোধ, যেখানে ব্যক্তি অন্যের কল্যাণে সচেতনভাবে কাজ করে। গান্ধীর মতে, অহিংস জীবনাচার মানে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং ব্যক্তির আত্মমর্যাদার স্বীকৃতি। এই নীতি সমাজের প্রতিটি স্তরে— পরিবার, শিক্ষা, রাজনীতি ও ধর্ম— ব্যবহারযোগ্য। অহিংসা শুধুই একটি বিরোধ বা সংঘাত সমাধানের পন্থা নয়, বরং এটি একটি সামাজিক সম্পর্কের কাঠামো নির্মাণের আদর্শ। এটি ক্ষমতা ও আধিপত্যবাদের পরিবর্তে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে। গান্ধীর অহিংসার দর্শন বর্তমান সমাজে আরও প্রাসঙ্গিক যেখানে সহিংসতা একটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Durkheim-এর ধারণা অনুযায়ী, সামাজিক সংহতির মূল ভিত্তি হল নৈতিক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক সম্মানবোধ, যা গান্ধীর অহিংসার চেতনায় নিহিত। অতএব, অহিংসাকে একটি কার্যকর সমাজবৈজ্ঞানিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা যায়, যা সমাজে শান্তি, সাম্য ও সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

সত্যগ্রহ : আত্মশুদ্ধি ও সামাজিক প্রতিরোধের দর্শন : সত্যগ্রহ গান্ধীর দর্শনের একটি মৌলিক উপাদান, যা কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয় বরং একটি আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া ও নৈতিক সমাজ গঠনের হাতিয়ার। এটি সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের একটি সক্রিয় রূপ। গান্ধী নিজেই বলেছেন, -

“Satyagraha is a relentless search for truth and a determination to reach truth.”^২

সত্যগ্রহ একটি এমন কৌশল যা সমাজে অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নৈতিক শক্তির মাধ্যমে প্রতিবাদ করে। সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটি এক ধরনের ‘Moral Agency’-র চর্চা যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ সম্মিলিতভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যায়। গান্ধীর সত্যগ্রহের মূল দর্শন হল— নির্মল অন্তর, অহিংস মনোভাব ও সত্যের প্রতি অবিচল থাকা। এটি ব্যক্তিকে শুধু প্রতিরোধকারী হিসেবে নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে তুলে ধরে।

সত্যগ্রহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আত্মত্যাগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমাশীলতা। এটি প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে না, বরং তার বিবেক জাগ্রত করে। সমাজবিজ্ঞানী Max Weber যে ‘Ethic of Responsibility’ ও ‘Ethic of Conviction’-এর কথা বলেন, সত্যগ্রহ তার একটি নিখুঁত উদাহরণ যেখানে নৈতিক দায়িত্ব ও সত্যবোধ একত্রে কাজ করে। Habermas-এর Communicative Action তত্ত্ব যেখানে যুক্তিসংগত সংলাপ ও নৈতিক যুক্তিকে সামাজিক পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে, সেখানে গান্ধীর সত্যগ্রহ একই ধরনের কাঠামো প্রস্তাব করে। সত্যগ্রহ এমন এক সামাজিক চেতনার জন্ম দেয় যা সহিংসতা, প্রতিহিংসা ও আধিপত্যবাদের পরিবর্তে সহমর্মিতা, সংলাপ এবং আত্মিক বোধের উপর নির্ভরশীল। সত্যগ্রহের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর গণতান্ত্রিক চরিত্র। গান্ধীর মতে, এই পদ্ধতি শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সাধারণ জনগণ, কৃষক, শ্রমিক, নারী—সবার জন্য উপযোগী। এর মাধ্যমে তিনি একটি সমবেদনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নৈতিক সমাজের রূপরেখা প্রস্তাব করেন যেখানে সহিংসতার পরিবর্তে আত্মসংযম ও নৈতিকতা সমাজ পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার। আধুনিক যুগে যেখানে প্রতিবাদ আন্দোলন অনেক সময় হিংস্র রূপ ধারণ করে, সেখানে সত্যগ্রহ একটি কার্যকর ও র‍্যাডিকাল বিকল্প দর্শন হিসেবে আবির্ভূত হয়। অতএব, গান্ধীর সত্যগ্রহ শুধু একটি কৌশল নয়; এটি একটি জীবনের দর্শন, একটি নৈতিক আন্দোলন এবং একটি সমাজ গঠনের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি। এটি আধুনিক সমাজবিজ্ঞান এবং রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসূত্র হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়।

সম্পদের সামাজিক দায়িত্ব (ট্রাস্টশিপ) ও শ্রমের মর্যাদা : সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উপায় : গান্ধীর সম্পদের সামাজিক দায়িত্বের (ট্রাস্টশিপ) নীতি ছিল এক বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক ভাবনা যা সমাজে সম্পদ ও শক্তির পুনর্বিন্যাসের একটি নৈতিক পথ নির্দেশ করে। এই ধারণার মূল ছিল, সমাজের ধনী ও ক্ষমতাসালী ব্যক্তি সম্পদের মালিক নয় বরং তার ‘ট্রাস্টি’ বা ‘অভিভাবক’ — এই সম্পদ ব্যবহার করা উচিত সমাজের কল্যাণে। গান্ধী বিশ্বাস করতেন, -

“Wealth should be held in trust for the welfare of all.”⁶

অর্থাৎ ধনীর কর্তব্য সমাজের কল্যাণে সেই সম্পদ ব্যবহার করা, এবং তার ভোগ সীমিত রাখতে হবে। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় গান্ধীর এই ধারণাটি Karl Polanyi-এর ‘Embedded Economy’ মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়, যেখানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক কেবল বাজারের উপর নির্ভরশীল নয় বরং সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। গান্ধীর এই অভিভাবকত্বের (ট্রাস্টশিপ) ধারণা শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের এক শান্তিপূর্ণ বিকল্প প্রস্তাব করে। Marx যেখানে শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমে পরিবর্তনকে দেখেছেন, সেখানে গান্ধী সহযোগিতার ভিত্তিতে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এতে ব্যক্তির উপর নৈতিক দায়িত্ব আরোপ হয় এবং এটি সমাজে স্বাভাবিক ন্যায্যতা ও সংহতি রক্ষা করতে সহায়তা করে। এই নীতি অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় একটি নৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে, যা আধুনিক ‘Ethical Capitalism’-এর অনুরূপ। শ্রমের মর্যাদা গান্ধীর মানবতাবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি চরকা, হস্তশিল্প ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে উৎসাহ দিয়ে স্বনির্ভর সমাজ গঠনের চেষ্টা করেছেন। শ্রমকে তিনি কেবল অর্থনৈতিক উৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে দেখেননি, বরং তা ছিল আত্মসম্মান, শৃঙ্খলা ও সমাজগঠনের একটি নৈতিক ভিত্তি। তিনি বলেন, "Real independence will come not by the acquisition of authority by a few but by the acquisition of the capacity by all to resist authority when abused" (Young India, 1927)। এটি শ্রমজীবী শ্রেণির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আত্মমর্যাদার শক্তিশালী প্রতিফলন। Pierre Bourdieu-এর 'Cultural Capital' ধারণা অনুযায়ী, সমাজে ক্ষমতা কেবল অর্থনৈতিক নয় বরং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূলধনের উপরেও নির্ভরশীল। গান্ধী যখন শ্রমিকের শ্রম ও দক্ষতাকে সম্মান দেন, তখন তিনি এই ক্ষমতার কাঠামোতে এক ধরনের নৈতিক বিপ্লব ঘটান। তিনি বলেছিলেন, "If we want to attain real freedom, we must learn to respect labour." তাঁর কাছে শ্রম মানে আত্মশক্তি, আত্মসম্মান এবং সমাজে সক্রিয় ভূমিকা। এটি শ্রেণিবিন্যাস ভেঙে মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলে। আধুনিক সমাজে যেখানে কর্পোরেট পুঁজিবাদ শ্রমিককে কেবলমাত্র উৎপাদন যন্ত্র হিসেবে দেখে, সেখানে গান্ধীর শ্রমচিন্তা এক মানবিক, নৈতিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকল্প প্রদান করে। এটি সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানব মর্যাদার প্রশ্নে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে। সমাজবিজ্ঞানের

আলোকে এই দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক গতিশীলতা, মর্যাদার ন্যায়বণ্টন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অতএব, গান্ধীর সম্পদের সামাজিক দায়িত্ব ও শ্রমের মর্যাদার দর্শন আধুনিক সমাজ নির্মাণে একটি কার্যকর ও মানবিক পথনির্দেশ প্রদান করে।

গ্রামীণ স্বরাজ ও বিকেন্দ্রীকরণ : বিকল্প উন্নয়নের মডেল : গান্ধীর বিকল্প সমাজচিত্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর ‘গ্রামীণ স্বরাজ’ ধারণা। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের প্রকৃত আত্মা গ্রামে বাস করে এবং একটি সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য গ্রামীণ কাঠামোর উন্নয়ন অপরিহার্য। তাঁর ভাষায়, -

“My idea of Village Swaraj is that it is a complete republic, independent of its neighbours for its own vital wants.”⁸

এই স্বরাজ কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর বিকল্প রূপ, যেখানে প্রতিটি গ্রাম হবে আত্মনির্ভর, বিকেন্দ্রীভূত এবং নৈতিকভাবে সুসংহত। গান্ধীর গ্রামীণ স্বরাজের কেন্দ্রীয় উপাদান হল স্থানীয় সম্পদের উপর স্থানীয় মানুষের নিয়ন্ত্রণ। এতে প্রাধান্য পায় স্থানীয় উৎপাদন, হস্তশিল্প, সমবায় পদ্ধতি এবং স্বশিক্ষিত জনশক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই কাঠামো আধুনিক বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়ে নিচু স্তরে বিভাজিত হয়। সমাজবিজ্ঞানী Elinor Ostrom-এর ‘commons’ ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় সম্পদের যৌথ মালিকানা ধারণার সঙ্গে গান্ধীর ভাবনার মিল লক্ষ্য করা যায়। উন্নয়ন সমাজবিজ্ঞানের আলোকে গান্ধীর এই ধারণাকে ‘Participatory Development’ কিংবা ‘Alternative Development’ মডেলের অধীনে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। এই মডেলে উন্নয়ন কেবল জিডিপি প্রবৃদ্ধি বা শিল্পায়নের মাধ্যমে নয়, বরং সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। Amartya Sen-এর ‘Development as Freedom’ তত্ত্বের সঙ্গে গান্ধীর গ্রামীণ স্বরাজের একটি সুস্পষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উভয়েই ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে উন্নয়নের মৌলিক সূচক হিসেবে দেখেছেন।

গান্ধীর মতে, প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সমাজের প্রত্যেক সদস্য নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সমাজের কল্যাণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। তাঁর ‘স্বনির্ভর গ্রাম’ ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ধারক। আধুনিক রাষ্ট্রকেন্দ্রিক উন্নয়ন যেখানে একক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হয়, সেখানে গান্ধীর বিকল্প উন্নয়নচিন্তা সমাজের বহুত্ব ও স্বাভাবিক রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখে। আজকের বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন, নগরায়ণ ও গ্রামীণ অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে গান্ধীর গ্রামীণ স্বরাজ নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এই দর্শন এক শক্তিশালী নৈতিক ও প্রয়োগযোগ্য ভিত্তি প্রদান করে। সামাজিক বৈষম্য কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমেও এটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অতএব, গান্ধীর গ্রামীণ স্বরাজ কেবল একটি ঐতিহাসিক আদর্শ নয়, বরং একটি সমকালীন উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি, যা সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও নৈতিক দর্শনের সংমিশ্রণে গঠিত একটি টেকসই সমাজ কাঠামোর রূপরেখা প্রদান করে।

নারী, বর্ণ ও ধর্ম: অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবতাবাদের রূপরেখা : গান্ধীর মানবতাবাদ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা সামাজিক ন্যায়বিচার, লিঙ্গসমতা, বর্ণভেদ প্রথার বিলোপ এবং ধর্মীয় সহাবস্থানের একটি নৈতিক ও সার্বজনীন দর্শন গড়ে তোলে। তাঁর দৃষ্টিতে নারীর ভূমিকা ছিল সমাজের পুনর্গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নারীদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে বলেন, -

“Woman is the companion of man, gifted with equal mental capacities.”⁹

এটি কেবল একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং সমাজে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার এক দৃষ্টান্তমূলক ঘোষণা। গান্ধী নারীদের অহিংস আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করেন— চলচ্চিত্রে যেমন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরা, কাস্তুরবা গান্ধীর নেতৃত্বে নারী অংশগ্রহণ একটি সমাজতাত্ত্বিক পুনর্বিব্যাঙ্গের সূচনা করে। গান্ধীর বর্ণপ্রথা-বিরোধী অবস্থান ছিল অস্পষ্ট নয় বরং অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, -

“Untouchability is a blot on Hinduism and must be removed.”^৬

তাঁর হরিজন আন্দোলন অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি তাঁদের ‘ঈশ্বরের মানুষ’ আখ্যা দিয়ে সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। Durkheim-এর ‘মেকানিক্যাল সংহতি’ ধারণার সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গির মিল খুঁজে পাওয়া যায়— যেখানে সামাজিক ঐক্য গড়ে ওঠে সমবেদনা, নৈতিক কর্তব্য ও সম্মিলিত আচরণের ভিত্তিতে। গান্ধী বর্ণ-ভেদমূলক সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক রূপরেখা তৈরি করেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা গান্ধীর মানবতাবাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমস্ত ধর্মই সত্যের অনুসন্ধানের এক একটি পথ এবং তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার মাধ্যমে সহাবস্থান করতে পারে। তাঁর মতে, - “I believe in the fundamental truth of all great religions of the world” (Young India, 1920)। এটি ভারতীয় বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের এক শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। আজকের বিভাজনের রাজনীতিতে এই দর্শন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—যেখানে ধর্মীয় বিভেদ একটি সহিংস ও বর্ণবৈষম্যমূলক সমাজ নির্মাণের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। সমাজবিজ্ঞানের আলোকে গান্ধীর এই অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবতাবাদ একটি বিকল্প সামাজিক সংগঠনের রূপরেখা তৈরি করে, যেখানে মর্যাদা, ন্যায়, সম্মান এবং নৈতিকতাকে সমাজ কাঠামোর কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়। নারী, দলিত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা ও সংগ্রাম একটি র‍্যাডিক্যাল মানবিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হিসেবে দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবিজ্ঞানী Iris Marion Young-এর ‘Politics of Difference’ তত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পরিচয় ও মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়। অতএব, গান্ধীর নারীবাদ, বর্ণবাদবিরোধিতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সমন্বয়ে গঠিত অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবতাবাদ কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং একটি জীবন্ত ও প্রয়োগযোগ্য সামাজিক দর্শন, যা আধুনিক সমাজের বৈষম্য, বঞ্চনা ও সহিংসতা রোধে একটি কার্যকর নৈতিক কাঠামো নির্মাণ করে।

গান্ধী ও আধুনিক সমাজবিজ্ঞান: তাত্ত্বিক সংলাপ : গান্ধীর দর্শন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের নানান তাত্ত্বিক প্রবাহের সঙ্গে একটি গভীর সংলাপ সৃষ্টি করে। যদিও তিনি নিজেকে সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে চিহ্নিত করেননি, তবুও তাঁর ভাবনার সঙ্গে Émile Durkheim, Max Weber, Anthony Giddens ও Jürgen Habermas-এর মত চিন্তকদের তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। এই অংশে গান্ধীর মানবতাবাদী নৈতিক দর্শনের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামোগুলোর সম্ভাব্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রথমত, Durkheim-এর সামাজিক সংহতির তত্ত্ব (Mechanical and Organic Solidarity) গান্ধীর সমাজবীক্ষণের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। Durkheim বিশ্বাস করতেন, সমাজে নৈতিকতা এবং সামূহিক চেতনা (collective conscience) সামাজিক সংহতির মূল ভিত্তি। গান্ধীও মনে করতেন, একটি সমাজ কেবল আইন বা শাসনের দ্বারা টিকতে পারে না, বরং তার ভিতরকার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। অহিংসা ও সত্যগ্রহ এই ধরনের নৈতিক সংহতির ভিত্তি তৈরি করে।

দ্বিতীয়ত, Max Weber-এর সামাজিক কর্ম তত্ত্ব (Social Action Theory) গান্ধীর নীতিনির্ভর সামাজিক প্রতিরোধের সঙ্গে তুলনীয়। Weber যে চারটি কর্মের ধরণ নির্ধারণ করেন (traditional, affectual, value-rational, instrumental), গান্ধীর সত্যগ্রহ মূলত value-rational কর্মের শ্রেণিতে পড়ে। গান্ধীর সমস্ত আন্দোলন নৈতিক আদর্শ ও চেতনার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে, যা Weber-এর মতে একটি নির্দিষ্ট রকমের যুক্তিকর্ম বা আদর্শমূলক সামাজিক আচরণ।

তৃতীয়ত, Anthony Giddens-এর Structuration Theory, যেখানে ব্যক্তি ও সামাজিক কাঠামোর পারস্পরিক নির্ভরতা তুলে ধরা হয়েছে, তা গান্ধীর ‘Be the change you want to see in the world’ ধারণার সঙ্গে গভীর মিল রাখে। গিডেন্স বলেন, ব্যক্তি কাঠামোর দ্বারা প্রভাবিত হয় আবার কাঠামোও ব্যক্তির দ্বারা নির্মিত হয়। গান্ধীও

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার এই দ্বিমুখী সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তি তার আচরণ পরিবর্তন করে সমাজকে পরিবর্তনের পথে পরিচালিত করতে পারে— এটি গান্ধীর নৈতিক রাজনীতির মূল ভিত্তি।

চতুর্থত, Habermas-এর Communicative Action তত্ত্ব, যেখানে ন্যায্যভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য যুক্তিসংগত সংলাপ এবং আন্তঃবিষয়ক বোঝাপড়া অপরিহার্য, তা গান্ধীর সত্যগ্রহের নৈতিক কাঠামোর সঙ্গে অভিন্ন। গান্ধী বিশ্বাস করতেন, সমাজে পরিবর্তন আনতে হলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সহিংসতা নয় বরং সহানুভূতিশীল যুক্তি, সংলাপ ও নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করতেন যে সত্য একটি বহুমাত্রিক ধারণা এবং তা আবিস্কৃত হয় আন্তঃসম্পর্ক, সংলাপ ও নৈতিক আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে।

এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে বোঝা যায়, গান্ধীর দর্শন একটি সমান্তরাল সমাজবিজ্ঞান গঠনের চেষ্টা করে, যা আধুনিক তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে যুগপৎ চলতে পারে। তিনি প্রতিষ্ঠান, শ্রেণি, ক্ষমতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যেভাবে চিন্তা করেছেন, তা তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন অহিংসা, নৈতিক অর্থনীতি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক ন্যায্যবিচারের মধ্যে দৃশ্যমান। অতএব, গান্ধীর মানবতাবাদ কেবল একটি নৈতিক আদর্শ নয়; এটি একটি সমাজতাত্ত্বিক পাঠও বটে, যা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সঙ্গে তাত্ত্বিক সংলাপের মাধ্যমে নতুন আলোকপাত করে সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবর্তনের সম্ভাব্য কাঠামো তুলে ধরে।

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা : গান্ধীর মানবতাবাদ ও বর্তমান সমাজ : বর্তমান বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে গান্ধীর মানবতাবাদ আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজকের সমাজে যেখানে বৈষম্য, সহিংসতা, পরিবেশ বিপর্যয়, ধর্মীয় মেরুকরণ ও রাজনৈতিক অসহিংসতা বেড়েই চলেছে, সেখানে গান্ধীর অহিংসা, সত্যগ্রহ, সাম্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নৈতিকতা এক বিকল্প দর্শন হিসেবে ফিরে আসে। গান্ধীর মানবতাবাদ একদিকে যেমন রাজনৈতিক প্রতিবাদকে নৈতিক কাঠামোতে রূপান্তরিত করে, অন্যদিকে তা সমাজ পুনর্গঠনের পথ নির্দেশ করে। আধুনিক সমাজের বৃহৎ একটি সমস্যা হল বৈষম্য— জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ ও ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত বিভাজন। এই বৈষম্য সামাজিক শোষণ, দারিদ্র্য ও সহিংসতার উৎস। গান্ধীর দর্শন এই বৈষম্যগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ব্যক্তির মর্যাদা, দায়িত্ব ও আত্মশুদ্ধির উপর জোর দেয়। তাঁর মতে, প্রকৃত পরিবর্তন ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু হয় এবং তা সমাজে প্রতিফলিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক 'Grassroots Democracy' ও 'Participatory Citizenship'-এর ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিবেশ সংকটের দিক থেকেও গান্ধীর চিন্তা আজ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর স্বনিয়ন্ত্রিত ভোগ, গ্রামীণ উৎপাদন, স্থানীয় সম্পদের উপর নির্ভরতা ও স্বনির্ভর জীবনযাত্রার ধারণা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। তিনি বলেছিলেন, "The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed." এই উক্তি ভোগবাদ, কর্পোরেট শোষণ এবং অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী মানবতাবাদী অবস্থান তুলে ধরে। আজকের ক্লাইমেট চেঞ্জ ও ইকো-জাস্টিস আলোচনায় গান্ধীর এই চিন্তা নতুন করে পাঠযোগ্য। রাজনৈতিক সহিংসতা ও ধর্মীয় হানাহানির যুগে গান্ধীর সহিংসতা, সংলাপ ও অহিংস প্রতিরোধের বার্তা আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় এক কার্যকর কৌশল। তাঁর 'সর্বধর্ম সমভাব' দর্শন আজকের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে সংলাপ তৈরি করে। সাম্প্রতিক কালে ভারত, মায়ানমার, প্যালেস্টাইন, কিংবা আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে সামাজিক সহিংসতা ও রাষ্ট্রের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের মধ্যেই গান্ধীর দর্শনের পুনর্পাঠ আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক অসমতা এবং কর্পোরেট পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে যে সামাজিক বঞ্চনা তৈরি হয়েছে, তার প্রতিকার হিসেবে গান্ধীর ট্রাস্টশিপ ধারণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ধনী শ্রেণির সামাজিক দায়বদ্ধতা, সম্পদের নৈতিক ব্যবহার ও শ্রমিক শ্রেণির মর্যাদার প্রতিফলন বর্তমান সমাজে কার্যকর সমাজনীতির রূপরেখা দিতে পারে। শিক্ষা, নারীবাদ, সামাজিক ন্যায্যবিচার ও ক্ষমতায়নের প্রশ্নেও গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নৈতিক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত সমাজের সন্ধান দেয়। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, জাতিগত বৈষম্য, এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের সময়ে গান্ধীর নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শ আমাদের সামাজিক সুশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হতে পারে। অতএব, গান্ধীর মানবতাবাদ শুধু ইতিহাসের অংশ নয়, এটি একটি জীবন্ত দর্শন যা সমকালীন সমাজের নৈতিক সংকট, বৈষম্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে কার্যকর নৈতিক কাঠামো ও সমাজবদলের সম্ভাব্য উপায় প্রদান করে। একবিংশ শতাব্দীতে গান্ধীকে নতুনভাবে

বুঝে নেওয়া, তাঁর দর্শনের সামাজিক প্রয়োগ এবং সমাজবিজ্ঞান চর্চায় তাকে পুনঃস্থাপন করা সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

উপসংহার : উপসংহারে বলা যায়, মহাত্মা গান্ধীর মানবতাবাদ কেবল একটি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নয়, বরং তা এক বহুমাত্রিক সমাজবৈজ্ঞানিক কাঠামো যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের একটি আদর্শ দর্শন। তাঁর অহিংসা, সত্যগ্রহ, ট্রাস্টশিপ, গ্রামীণ স্বরাজ, শ্রমের মর্যাদা, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা—এই প্রতিটি দিক সমাজবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে একটি আন্তঃসংলাপ সৃষ্টি করে। সমাজবিজ্ঞানের আলোকে গান্ধীর মানবতাবাদ শুধু সমাজ বিশ্লেষণের উপকরণ নয়, বরং তা সমাজ পরিবর্তনের এক সম্ভাব্য পথও নির্দেশ করে। Durkheim, Weber, Giddens, এবং Habermas-এর মতো তাত্ত্বিকদের সঙ্গে গান্ধীর ধারণাগুলোর তুলনা প্রমাণ করে যে, তাঁর ভাবনা একটি আলাদা ধারা নির্মাণ করে যা নৈতিকতা, কার্যকর প্রতিরোধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ন্যায়বিচারের ওপর গঠিত। এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে গান্ধীর দর্শন আজকের বৈষম্যমূলক, সহিংস এবং নৈতিক সংকটে ভোগা সমাজে এক নবজাগরণের সুযোগ এনে দিতে পারে। তাঁর মানবতাবাদ আমাদের শেখায়—সমাজের পরিবর্তন একা রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তির অন্তর থেকেই শুরু হতে পারে। অতএব, “গান্ধীয় মানবতাবাদের সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি” একটি জীবন্ত, গতিশীল ও প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের জগতে তার স্থান নিশ্চিত করে। এ দর্শন শুধু অতীতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নয়, বরং সমকালীন ও ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ দিকদর্শন হয়ে উঠতে পারে।

Reference:

1. Gandhi, M.K. Harijan. Navajivan Publishing House, 1936, p. 23
2. Gandhi, M.K. The Story of My Experiments with Truth. Translated by Mahadev Desai, Navajivan Publishing House, 1940, p. 132
3. Gandhi, M.K. Harijan. Navajivan Publishing House, 1940, p. 87
8. Gandhi, M.K. Young India. Navajivan Publishing House, 1921, p. 221
৫. Gandhi, M.K. Harijan. Navajivan Publishing House, 1939, p. 76
৬. Gandhi, M.K. Young India. Navajivan Publishing House, 1925, p. 145

Bibliography:

- Gandhi, M.K. Young India. Navajivan Publishing House, 1927.
- Durkheim, Emile. The Division of Labor in Society. Translated by W.D. Halls, Free Press, 1997
- Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press, 1978
- Giddens, Anthony. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Polity Press, 1984
- Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society. Translated by Thomas McCarthy, Beacon Press, 1984
- Polanyi, Karl. The Great Transformation. Beacon Press, 1944
- Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press, 1977
- Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford University Press, 1999
- Parekh, Bhikhu. Gandhi: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2001
- Ostrom, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990
- Young, Iris Marion. Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press, 1990